

অবক্ষয়কাল

অধিকারের মোড়কে বিকৃতির আন্দোলন

আসিফ আদনান



সূচিপত্র

ভূমিকা | ৭

এই সব ক্রেদান্ত জীবন (১৪-১২১)

অধ্যায় ১: পরিচয় নির্মাণ | ১৫

অধ্যায় ২: বার্লিন ব্যাবিলন | ৩০

অধ্যায় ৩: কলুষতার কারিগর | ৪১

অধ্যায় ৪: আন্দোলন | ৫৯

অধ্যায় ৫: প্লেগ | ৭৩

অধ্যায় ৬: এলজিবিটি | ৮৯

অধ্যায় ৭: কারিকুরি | ১০৪

অধ্যায় ৮: বিকৃতির ধ্রুবক | ১১৭

পশ্চিম রূপান্তর (১২২-২৫৮)

অধ্যায় ৯: বিভীষিকা | ১২৩

অধ্যায় ১০: ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ | ১৩৪

অধ্যায় ১১: জোড়াতালি | ১৪৪

অধ্যায় ১২: মুখ ও মুখোশ | ১৫৮

অধ্যায় ১৩: কলুষতার বংশগতি | ১৭৫

অধ্যায় ১৪: তত্ত্ব-তালাশ | ১৮৬

অধ্যায় ১৫: আকাশকুসুম তাত্ত্বিকতা | ১৯৬

অধ্যায় ১৬: বিষচক্র | ২০৯

অধ্যায় ১৭: মাকড়সার জাল | ২১৭

অধ্যায় ১৮: বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা | ২২৮

অধ্যায় ১৯: যৌন উপনিবেশবাদ | ২৫৩

আনো অন্ধকার (২৫৯-৩৬১)

অধ্যায় ২০: বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব | ২৬০

অধ্যায় ২১: আধুনিকতা : সবার ওপরে মানুষ সত্য | ২৭০

অধ্যায় ২২: ব্যবচ্ছেদ | ২৮৩

অধ্যায় ২৩: দ্বীন ইসলাম : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ | ২৯৮

অধ্যায় ২৪: দ্বীন ইসলামের লেসে এলজিবিটি মতবাদ | ৩১১

অধ্যায় ২৫: যৌনতা ও যৌন বিকৃতি : ইসলামের অবস্থান | ৩১৮

অধ্যায় ২৬: কিছু আপত্তি ও তার জবাব | ৩৩২

অধ্যায় ২৭: অবশ্যকাল | ৩৪৩

পরিশিষ্ট | ৩৬২

ভূমিকা

৭৯ খ্রিস্টাব্দ। ইটালির ক্যাম্পানিয়া অঞ্চল।

শহরটা ছিল আজকের দিনের নেইপলসের কাছাকাছি। এক পাশে সমুদ্র, গাঢ় নীল আর শান্ত। অন্য পাশে পাহাড়, তার গা ঘেঁষে থাকে সবুজ জলপাই গাছের বহর। ওপরে আকাশ; উজ্জ্বল, বিস্তৃত। মাঝখানে পম্পেই।

চোখ ধাঁধানো এই নাগরিক সভ্যতার শুরু খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে পৌঁছে যায় খ্যাতির শিখরে, হয়ে উঠে সমকালীন বিশ্বের অন্যতম অভিজাত নগরী। রাজকীয় ভিলা, চোখ ধাঁধানো সব স্থাপত্য, আর বিচিত্র নকশার ফোয়ারা দিয়ে সাজানো ছিল শহরটা। বিশাল বিশাল মন্দির বানানো হয়েছিল রোমান দেবতা জুপিটার আর অ্যাপোলোর সম্মানে। ঘর আর বাজারে পূজা হতো দেবতা ডায়োনাইসাসের। পম্পেইয়ের মাটিতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের আঙ্গুর ফলতো। ওখানকার আঙ্গুরমদের সুনাম ছিল পুরো রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে। ডায়োনাইসাস মদ আর মত্ততার দেবতা। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল শহরের লোকের।

আমোদপ্রমোদের জন্য ছিল অ্যাম্পফিথিয়েটার। গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই, হিংস্র পশু শিকার, রথের প্রতিযোগিতা, নাটক—উৎসবের নানা আয়োজন হতো সেখানে। পম্পেই ছিল একাধারে ব্যবসা, সংস্কৃতি, পর্যটন আর বিনোদনের কেন্দ্র। নাগরিক জীবনের সব উপকরণ মজুত ছিল সেখানে।

তবে এসব ছাপিয়ে উঠে আসতো আরেকটা পরিচয়। প্রায় বিশ হাজার অধিবাসীর এই শহরে সময় যেন একটু দ্রুত ছুটত। সবসময় আবেগ, উত্তেজনা আর রোমাঞ্ছের উঁচু তারে বাঁধা থাকতো জায়গাটা। শহরের মোড়ে মোড়ে ছিল মদের দোকান আর পতিতালয়। অবাধ, মুক্ত যৌনতা ছিল পম্পেইয়ের সংস্কৃতি। ঘরের দেয়াল, বাগানে ফোয়ারার নকশা, গগনমানাগারের ছাদ—সব জায়গাতে ছিল পর্নোগ্রাফিক ছবি। সেইসব ছবিতে ফুটে উঠতো সমকাম, উভকাম আর গগনযৌনতার দৃশ্য। পম্পেইয়ের যৌনতার বাজারে সব বৈধ ছিল। হাত বাড়ালে মিলতো সবই। নিজেকে হারিয়ে

ফেলার পর খুঁজে পেয়ে আবারও হারিয়ে ফেলার জন্যই যেন তৈরি হয়েছিল শহরটা। আর তাই এখানে মন্ত্রমুগ্ধের ছুটে আসতো নানা দেশ থেকে নানান রকমের মানুষ। তারুণ্যের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসের কেন্দ্র ছিল পম্পেই।

তবে চাঁদের বুকে কালিমার মতো একটা সমস্যা ছিল। দিগন্ত আড়াল করে থাকা ভিসুভিয়াস পর্বত। প্রায় ১৭ বছর আগে, ৬৩ খ্রিষ্টাব্দে এই ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পম্পেই। ধ্বংসাবশেষ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছিল আগের চেয়েও আকর্ষণীয়, আরও মনোমুগ্ধকর রূপে।

৭৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রায় পুরোটা বছরটা জুড়ে ভিসুভিয়াসের হস্তিত্ব চলছিল। হঠাৎ মাঝরাতে গর্জে উঠে অস্তিত্ব জানান দিতো। হালকা ভূমিকম্প নাড়া দিয়ে যেত মাঝেমধ্যে। ধীরে ধীরে ভূমিকম্পের সংখ্যা বাড়লো, কমলো মাঝখানের বিরতি। একসময় দেখা গেল ছাইরঙ্গা ভিসুভিয়াস পর্বতের ওপরটা ধোঁয়াতে ঢেকে গেছে। কিন্তু ততদিনে অভ্যাস হয়ে গেছে পম্পেইয়ের লোকেদের। ভিসুভিয়াসের তর্জনগর্জনকে খুব একটা গুরুত্ব দিলো না তারা। জীবন্ত আগ্নেয়গিরিকে পাশে রেখে জীবনের চেনা স্রোতের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে লাগলো।

আর তারপর... একদিন সকালে ব্যাপারটা ঘটলো।

প্রচণ্ড শক্তিতে সেকেন্ডে পনেরো লক্ষ টন গলিত পাথর, গুড়ো হয়ে যাওয়া আকরিক আর তরল আগুন ছুড়ে দেওয়া হলো মাটি থেকে প্রায় ২১ মাইল উঁচুতে। নিঃসরিত হলো হিরোশিমায় ফেলা পারমাণবিক বোমার চাইতে এক লক্ষ গুণ বেশি তাপশক্তি। প্রথম বিস্ফোরণের সময় তাপমাত্রা পৌঁছে গেল ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে মারা গেল হাজারো মানুষ। প্রচণ্ড তাপের কারণে সৃষ্ট থার্মাল শকে, তীব্র খিচুনিতে, তাদের শরীরগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেঁকে গেল। তারপর সব চাঁপা পড়লো ২১ ফিট গভীর আগ্নেয় ছাইয়ের নিচে।

আগুনের নদীর নিচে সমাধি হলো পম্পেইয়ের। রাতারাতি উধাও হয়ে গেল প্রাণবন্ত জনপদ। এভাবেই কেটে গেল দেড় হাজার বছর কিংবা আরও বেশি। তারপর হঠাৎ একদিন কোনো এক রাজার প্রাসাদ বানাতে গিয়ে পম্পেইয়ের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেল একদল নির্মাণশ্রমিক। শুরু হলো হারানো শহরের খোঁজ।

ভিসুভিয়াসের লাভা আর ছাই প্রস্তরীভূত করে ফেলেছিল পম্পেইকে। পুরু ছাই আর আগ্নেয় পাথরের প্রলেপে অবিকল সংরক্ষিত ছিল সবকিছু। বিচিত্রভাবে তরল আগুন যেন জমিয়ে রেখেছিল শহরটাকে। মাটি খুঁড়ে প্রথম যেসব নিদর্শন পাওয়া গেল, তার মধ্যে ছিল পম্পেইয়ের আদিম উল্লাসের পর্নোগ্রাফিক চিত্রকর্ম।

পম্পেইয়ের ঘটনা দুইভাবে দেখা যায়।

এক দৃষ্টিকোণ থেকে পম্পেই এক রোমান ট্রাজেডি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে প্রাণবন্ত এই নগরী। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিশ্বের। প্রগতিশীল ও সেকুলার মানুষদের।

অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, পম্পেইয়ের এই পরিণতি জনপদের লোকেদের সীমালঙ্ঘন আর অবক্ষয়ের শাস্তি। ইতিহাসের পাতায় চিরদিন অগ্নিসমাধির শহর হিসেবে পরিচিত হবে পম্পেই। তার অস্তিত্ব মুছে গেছে, রয়ে গেছে ধ্বংসের শিক্ষা।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পম্পেই ধ্বংসের সাথে সেখানকার মানুষের যৌনতার কোনো সম্পর্ক নেই। যৌনতা মানুষের জীবনযাত্রার কেবল একটা অনুষঙ্গ। আশ্বেয়গিরির বিস্ফোরণের সাথে এর যোগসূত্র খুঁজে বের করা অযৌক্তিক। একটা সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপার, আরেকটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর সবাই জানে, দুটো একেবারেই আলাদা জিনিস। পম্পেইয়ের অধিবাসীরা যদি কোনো ভুল করে থাকে তবে সেটা হলো, দিনের পর দিন ভিসুভিয়াসের গর্জনকে উপেক্ষা করা। শিক্ষা নিতে হলে এখান থেকে নেওয়া উচিত।

অন্যদিকে একজন বিশ্বাসী পম্পেইয়ের মিল খুঁজে পাবে কুরআনে বর্ণিত এক সম্প্রদায়ের ঘটনার সাথে। কুরআনে নবী লূত আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। তাঁকে এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিল, যারা যৌন বিকৃতিতে আসক্ত ছিল। এ জনপদের পুরুষেরা একে অপরের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হতো। নবীর সব শিক্ষা আর হুশিয়ারি তারা তচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেছিল। মহান আল্লাহ ভয়ঙ্কর আযাব দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দেন। কুরআন ও হাদীসে এই আযাবের বর্ণনা এসেছে।

প্রথমে তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হয়। তারপর পুরো জনপদকে শূন্যে তুলে উলটো করে সজোরে ছুড়ে ফেলা হয় মাটিতে। আর তারপর শুরু হয় আসমান থেকে উত্তপ্ত পাথরবৃষ্টি। বিরামহীন আযাব। এই সম্প্রদায় আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মকে উলটে দিয়েছিল। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতার বদলে বিকৃত যৌনতাকে বেছে নিয়েছিল তারা। তাই শাস্তি হিসেবে তাদের জনপদকে উলটে দেওয়া হয়।

‘সুতরাং আশ্বাদন করো আমার শাস্তি এবং ভীতিপ্রদর্শনের পরিণাম।’^[১]

সবশেষে মৃত সাগরের পাড়ে পড়ে ছিল কওমে লূত; মৃত ও অভিশপ্ত।

কুরআন ও হাদীসে পম্পেইয়ের ঘটনা নিয়ে আলোচনা আসেনি। তাই যৌন অবক্ষয় আর সীমালঙ্ঘনের কারণেই যে এ নগরী ধ্বংস হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা

[১] আল কুরআন, তরজমা, সূরা আল-ক্বামার, ৩৯

যায় না। তবে কওমে লুতের সাথে পম্পেইয়ের মিলগুলো একজন বিশ্বাসীর চোখ এড়িয়ে যাবে না। একজন বিশ্বাসী বলবে, স্থান-কাল আলাদা হলেও অদ্ভুত মিল আছে দুটো ঘটনার মধ্যে। একই ধরনের সীমালঙ্ঘন, অনেকটা একই ধরনের শাস্তি। একই শিক্ষা।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বারবার আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠবে।

দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ, অতীতকে বোঝা এবং বর্তমানের মূল্যায়ন, দুটোর জন্যেই। কারণ অতীতে যা হয়েছিল, আজ তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। আজ পৃথিবীর প্রায় তিন ডজন দেশে দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারীর মধ্যে 'বিয়ে' আইনি ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার বৈধতা দিয়েছে প্রায় ১৩০টি দেশ। স্বাধীনতা আর মানবাধিকারের আলাপ তুলে বাকি দেশগুলোকেও একই পথ বেছে নেওয়ার চাপ দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।

মানুষ আজ পোশাকের মতো পরিচয় বদলাচ্ছে। পুরুষ নিজেকে নারী দাবি করছে, নারীদের পোশাক পরে তাদের জন্য নির্ধারিত টয়লেট বা অন্য কোনো স্থানে হাজির হয়ে যাচ্ছে এবং সেই দাবি মেনেও নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্ব এ ব্যাপারগুলো কেবল মেনে নেয়নি; বরং শিক্ষা, মিডিয়া এবং রাজনীতির মাধ্যমে এগুলো প্রচার করছে। স্কুলে শেখানো হচ্ছে সমকাম, উভকাম, ইচ্ছেমতো পরিচয় বদলানো—সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যের ক্ষতি না করে যেকোনো কিছু করার অধিকার আছে মানুষের। বিকৃত যৌনতার প্রচারণাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে মার্কিন সরকার। সিএনএন জানাচ্ছে, বাংলাদেশের মতো জায়গাতেও এসব প্রতিষ্ঠার জন্য লাখ লাখ ডলার খরচ করছে অ্যামেরিকা।

প্রতিদিন যেন একটু একটু করে পম্পেইয়ের মতো হয়ে ওঠছে আমাদের পৃথিবী। মৃত সাগর পাড়ের শহরগুলোর সাথে আমাদের দূরত্ব কমছে ক্রমশ। এই জনপদগুলোর বাসিন্দারা শুধু কিছু 'কাজ' করে ক্ষান্ত হয়নি। তারা সেই কাজগুলোর প্রচার আর উদ্‌যাপন করেছিল। বৈধতা আর অজুহাত তৈরি করেছিল। ঠিক একই ব্যাপারটা ঘটছে আমাদের সভ্যতায়। তবে অতীতে যা হয়েছিল একেকটা শহর আর জনপদে, তা এখন হচ্ছে একেকটা দেশ আর মহাদেশ জুড়ে।

অথচ আজ থেকে একশো বছর আগে এ ব্যাপারগুলো অকল্পনীয় ছিল। বিকৃতির এই অভূতপূর্ব প্রসার ও স্বীকৃতি যে আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে আজ সেটা পরিচিত এলজিবিটি অধিকার আন্দোলন (LGBT Rights Movement) নামে।^[২] দেড়

[২] এলজিবিটি (এলজিবিটি) একটি গুচ্ছ শব্দ (acronym) যেখানে L দ্বারা লেসবিয়ান (lesbian) বা নারী সমকামী, G দ্বারা গে (Gay) বা পুরুষ সমকামী, B দ্বারা বাইসেক্সুয়াল (bisexual) বা উভকামী এবং T দ্বারা ট্রান্সজেন্ডার বোঝানো হয়।

শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে আজকের এই সাফল্য অর্জন করেছে তারা।

এই বই এলজিবিটি আন্দোলন নিয়ে। এ আন্দোলনের ইতিহাস, বংশগতি, বিবর্তন, তত্ত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে এ বইয়ের আলোচনা। একজন মুসলিম হিসেবে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্র ইসলাম। বইটি সেই অবস্থান থেকেই লেখা। তবে আন্দোলনের ইতিহাস এবং বংশগতির আলোচনা গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন পশ্চিমা এবং সেকুলার সোর্স থেকে। ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ এসেছে বইয়ের শেষ ভাগে।

অনেকে বলতে পারেন, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা ইসলামে হারাম, বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ করাও হারাম। ব্যস, কথা তো এখানেই শেষ। এ নিয়ে সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার বই লেখার কী দরকার? অল্প কিছু বিকৃত চিন্তার মানুষ এসব জঘন্য কাজ করে বেড়ায়। এসব নিয়ে বেশি কথা বললে, এগুলো আরও বেশি ছড়াবে।

এখানে দুটো বিষয় বোঝা জরুরি। প্রথমত, এলজিবিটি শ্রেফ অল্প কিছু বিকৃতকামী মানুষের আন্দোলন না। যদি তাই হতো, তাহলে এই আন্দোলন এত বিস্তৃত, এত প্রভাবশালী হয়ে ওঠতো না। আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত, এ নিয়ে এত শোরগোল, এত আয়োজন দেখতাম না আমরা। এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত অল্প কিছু মানুষ, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে প্রবল ক্ষমতাবানরা কিছু গোষ্ঠী।

দ্বিতীয়ত, এটি নিছক কিছু দাবি আদায়ের আন্দোলন না। এই আন্দোলনের একটি মতাদর্শিক দিক আছে। আছে সভ্যতাগত তাৎপর্য। যৌন বিকৃতির এই মতবাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে আধুনিক পশ্চিমা দর্শন ও জীবনবোধের। এ কারণেই আজ ‘আধুনিক’ ও ‘প্রগতিশীল’ হতে হলে এলজিবিটি অধিকারকে সমর্থন দেওয়া বাধ্যতামূলক। মতাদর্শিক এই দিকটি বোঝা প্রয়োজন।

এ ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট, খুব সংক্ষেপে দুই-তিন পৃষ্ঠার মধ্যে তা লিখে ফেলা সম্ভব—এ-কথা সত্য। তবে, যারা জীবনের সব অক্ষে ইসলামের শিক্ষা মেনে চলার চেষ্টা করেন, ঐ আলোচনা কেবল তাদের জন্যই যথেষ্ট হবে। যারা এমন না, যারা আধিপত্যশালী সংস্কৃতি ও শাসনব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত, আধুনিকতার নানা বিশ্বাসকে যারা চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, হুকুম-আহকামের বর্ণনা কিংবা ফাতওয়া তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। তাদের মনে প্রশ্ন থেকে যাবে।

যৌন বিকৃতি আজ একটা বৈশ্বিক প্রকল্প। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পলিসিকে এটি প্রভাবিত করেছে। এই প্রকল্পের মোকাবিলা করতে হলে, এই মতবাদকে প্রশ্ন করতে হলে, নিজের অবস্থানের সমর্থনে কথা বলতে হলে, এ আন্দোলনের ইতিহাস ও বংশগতি সম্পর্কে জানতে হবে। স্পষ্ট

ধারণা থাকতে হবে ইসলাম ও আধুনিক পশ্চিমা জীবনদর্শনের পার্থক্য ও দ্বন্দের ব্যাপারেও।

বইটি লিখতে গিয়ে নোংরামির অনেক বীভৎস ইতিহাস, বর্ণনা আর তত্ত্ব ঘাঁটতে হয়েছে। ব্যাপারটা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। অনেক ধোয়ামোছার পর, অনেক কিছু আড়াল করে, বাদ দিয়ে, সেইসব তথ্যের সামান্য কিছু অংশ এই বইতে আনা হয়েছে। তারপরও কিছু অধ্যায়ে বিকৃতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার দিকে তাকানোর অভিজ্ঞতা সুখকর হবার কথা না। বিশেষ করে ‘প্লেগ’ অধ্যায়ের আলোচনা। তাই পাঠকের কাছে শুরুতেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে এই বাস্তবতাগুলো তুলে আনা প্রয়োজন ছিল। অধিকার আর স্বাধীনতার মুখরোচক বুলির আড়ালে ঠিক কোন ধরনের আচরণ আর জীবনের স্বীকৃতি চাওয়া হচ্ছে, তা কীভাবে সমাজ ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করে, তা আমাদের জানা দরকার।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এলজিবিটি জীবনযাত্রার বাস্তবতাকে সুকৌশলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা হয়েছে। সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছে বানোয়াট একটা ছবি। কাজটা করা হয়েছে পরিকল্পিত প্রোপাগ্যান্ডার অংশ হিসেবে; যার উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন তৈরি করা এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়া। এজন্য কাজে লাগানো হয়েছে অ্যাডভারটাইজিং আর মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সব কৌশল। এই আন্দোলনের স্ট্র্যাটিজিস্টদের লেখায় সরাসরি এসব কথা উঠে এসেছে।^[৩] তাই কুৎসিত হলেও বাস্তবতাকে চিনে রাখা দরকার। তা না হলে খুব সহজেই আমরা প্রভাবিত হবো, প্রতারিত হবো, ফাঁদে পা দেবো। যেমনটা হয়েছে পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে।

সত্য যতই অপ্রিয় কিংবা অস্বস্তিকর হোক, প্রকাশ করতে হবে। কারণ, নীরবতার জন্য যে মূল্য দিতে হবে তা অনেক, অনেক চড়া। মহান আল্লাহ সত্য প্রকাশে কখনো সঙ্কোচবোধ করেন না। মুসলিম হিসেবে আমাদেরও করা উচিত না।

এ বইয়ের আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের আলোচনা ‘সমকামী আন্দোলনের’ ইতিহাস এবং প্রধান তাত্ত্বিকদের নিয়ে। (অধ্যায় ১-৮)

এলজিবিটি আন্দোলনের সবচেয়ে আগ্রাসী অংশ, ‘ট্রান্সজেন্ডারবাদ’ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অংশে। পশ্চিমা দেশগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় কীভাবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়ন হচ্ছে, এ অংশের

[৩] দেখুন, অধ্যায় ৬, এলজিবিটি

শেষে আলোকপাত করা হয়েছে তা নিয়ে। (অধ্যায় ৯-১৯)

তৃতীয় ভাগের আলোচনা এলজিবিটি মতবাদের সাথে আধুনিক জীবনদর্শনের সম্পর্ক এবং এ দুইয়ের সাথে ইসলামের সংঘাত নিয়ে। বিশ্বাসের মৌলিক কাঠামো, উৎস এবং পার্থক্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ইসলামের আলোকে এলজিবিটি আন্দোলনের মূল্যায়ন এসেছে এই অংশে। (অধ্যায় ২০-২৬)

সবশেষে আলোচনা এসেছে এলজিবিটি আন্দোলন সভ্যতাগত তাৎপর্য নিয়ে।

বইটির কাজে নানা জন নানাভাবে সহায়তা করেছেন। পারিবারিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও কয়েকটি অধ্যায়ের শারঙ্গ দিকগুলো দেখে দিয়েছেন মুফতি আবদুর রহমান ভাই। টানা কয়েক রাত জেগে বইয়ের প্রুফ আর পৃষ্ঠাসজ্জার কাজ করে দিয়েছে আসাদুল্লাহ আল গালিব। প্রচ্ছদ নিয়ে দিনের পর দিন সময় দিয়েছে ওমর ইবনে সাদিক। আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বিশেষভাবে শুকরিয়া জানাই অনুজ এনামুল হোসেইনকে, প্রচণ্ড ব্যস্ততা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে তার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য ও পরামর্শ জানানোর জন্য। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

যদি এ বইয়ের মাঝে কল্যাণকর কিছু থাকে, তবে সেটা এক আল্লাহরই পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি, সেটা একান্তই আমার। ইখলাস, নিয়্যাত ও আমলের সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ তাঁর এই অক্ষম বান্দার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন, এতে বারাকাহ এবং সাফল্য দান করুন। আমীন।

নিশ্চয়ই সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

আসিফ আদনান

রমাদান ১৪৪৫, মার্চ ২০২৪

অধ্যায় ১ পরিচয় নির্মাণ

জার্মানির উত্তরপশ্চিম অঞ্চল। উত্তর সাগর আর এমস নদীর মাঝখান দিয়ে, পূর্ব ফ্রিসিয়ার বুক চিরে সোজা এগিয়েছে এমস-জেইড খাল। আকাশ থেকে দেখলে খালটাকে চকচকে রূপালী ফিতার মতো মনে হবে। ৭২ কিলোমিটার লম্বা এ জলপথের দুপাশে ছড়িয়ে আছে গাঢ় সবুজ তৃণভূমি, উঁচুনিচু ছোট পাহাড় আর ছবির মতো সুন্দর গ্রাম।

এমনই এক গ্রাম ওয়েস্টারফেল্ড। ঘনসবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা গ্রামটার সরু রাস্তাগুলো খোয়া বিছানো। রাস্তার ধার ঘেঁষে সাজানো একই নকশার উজ্জ্বল রঙের অনেকগুলো বাড়ি। বসন্তে রকমারি ফুলের সমারোহ, হেমন্তে শুকনো পাতার উড়োউড়ি, আর শীতে তুষারের শুভ্র চাদরমোড়া—অদ্ভুত সৌন্দর্য ঘিরে আছে গ্রামটাকে। আমাদের গল্পের শুরু এই গ্রামে।

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে, ১৮২৫ সালে এ গ্রামেই জন্ম হয় এক শিশুর। বাবা-মা নাম রাখে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস। নাম রাখার সময় তারা কি ভেবেছিলেন, এই নাম একদিন ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে? অনেক অনেক বছর পরও তাকে নিয়ে চলবে আলোচনা আর সমালোচনা? হয়তো। সন্তান বড় হয়ে নাম করবে, এমন ইচ্ছা অনেক বাবা-মা'র মনে সুপ্ত থাকে। তবে দূরতম কল্পনাতেও সম্ভবত তারা আঁচ করতে পারেননি, তাদের এই সন্তান একদিন বিকৃতি আর অন্ধকারের এক সভ্যতাবিধ্বংসী মতবাদের গোড়াপত্তন করবে।

উলরিখস সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, বাবা ছিল সরকারি স্থপতি। তার শৈশব কেটেছিল বিশাল এক এস্টেটে। একমাত্র ছেলে হওয়াতে দু'বোনের চাইতে মায়ের আদর কিছুটা বেশিই বরাদ্দ থাকতো তার জন্য। আদরের আতিশয্য আর মায়ের মনের অজানা আশঙ্কার ভিড়ে গ্রামের অন্যদের সাথে খুব একটা মেলামেশা হতো না তার। এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, ছেলেবেলা থেকেই উলরিখস বেড়ে উঠে লাজুক এবং কিছুটা অমিশুক হয়ে।

এভাবেই দিন চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে। মারা যায় উলরিখসের বাবা। তার

বয়স তখন দশ। চৌদ্দ বছর বয়সে হাই স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাকে। প্রথম বছরেই শান্ত, চাঁপা স্বভাবের উলরিখসকে বাগে পেয়ে ধর্ষণ করে স্কুলের এক পুরুষ প্রশিক্ষক।^[৪] কৈশোরের এ নির্জন আশ্রাসনের চিহ্ন আজীবন বয়ে বেড়াবে উলরিখস। এই চিহ্নের প্রতিক্রিয়া লগুভগু করে ফেলবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অগণিত মানুষের জীবন।

স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ১৮৪৪ সালে উলরিখস পাড়ি জমায় গটিনগেন শহরে। আইনজীবী হবার জন্যে পড়াশোনা শুরু করে। তেমন কোনো অঘটন ছাড়াই কেটে যায় দুই বছর। তারপর জেগে উঠে অন্ধকারের স্রোত। ১৮৪৬-এ স্থানীয় এক বলনাচের আসরে কিছু স্কুল ছাত্রের ওপর নজর পড়ে তার। ইউনিফর্মপরা কিশোরদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে উলরিখস। যে বয়সে সে নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, এই ছাত্রদের বয়স ছিল তার কাছাকাছি।^[৫] ঐ রাতের পর অনেকটা ছুট করেই উলরিখস সিদ্ধান্ত নেয় গটিনগেন থেকে বার্লিন চলে যাবার। হঠাৎ নেওয়া এ সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্ক আছে সেই সময়কার বার্লিন নগরীর বিশেষ এক ‘সুখ্যাতি’র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই পতিতাবৃত্তির কেন্দ্র হিসেবে কুখ্যাত হয়ে উঠে বার্লিন। এ শহরের নিষিদ্ধ পল্লীগুলোর ‘সুনাং’ ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপে। নারীদেহের পাশাপাশি অল্প বয়সী পুরুষ দেহও দেদারসে বিক্রি হতো বার্লিনে। এই শহরেই শুরু হয় কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের জীবনের অন্ধকার অধ্যায়। দিনের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবোধ ছাত্র উলরিখস, রাতের বেলায় উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে বার্লিনের নিষিদ্ধ পল্লীতে। ঐ এলাকাগুলোতে, যেখানে আনাগোনা গরিব, বালক, আর ভবঘুরে কিশোরদের। টাকার বিনিময়ে তারা শরীর বিক্রি করত, আর তা কিনতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসতো ক্রেতারা। উলরিখস ছিল পরের দলে। পুরুষ দেহের খন্দের ছিল সে।

বার্লিনের অন্ধকার এ দিকের বর্ণনা পাওয়া যায় উইলহেল্ম স্টিবারের লেখা ‘Prostitution in Berlin and Its Victims’ (বার্লিনে পতিতাবৃত্তি এবং এর শিকার) বই থেকে। ১৮৬০ এর দশকে প্রুশিয়ার^[৬] প্রধানমন্ত্রীর সহকারী এবং দুর্ধর্ষ গুপ্তচর হিসেবে ইউরোপজুড়ে ব্যাপক পরিচিতি পাবেন স্টিবার। তবে তার আগে ঝানু এই

[৪] Making Queer History. Karl Heinrich Ulrichs, - <https://tinyurl.com/aj7dk9mr>

[৫] Vier Briefe von Karl Heinrich Ulrichs (Numa Numantius) an seine Verwandten, p 45. Edited by Magnus Hirschfeld. Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 1: 36–70. Reprint in Forschungen 1994. As quoted in, Kennedy, Hubert C. Karl Heinrichs Ulrichs: Pioneer Of The Modern Gay Movement. Peremptory Publications, 2005.

[৬] আজ যে দেশটাকে আমরা জার্মানি নামে চিনি ১৮৭১ সালের আগে সেটা একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না। ১৮০৬ সালের আগে এটি ছিল অনেকগুলি স্বতন্ত্র ও আলাদা রাজ্যের সমষ্টি। যার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল প্রুশিয়া। ১৮১৫ সালে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্রগুলি একটি কনফেডারেশন গঠন করে, যা স্থায়ী হয় ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত। ১৮৭১ সালে অটো ফন বিসমার্কের অধীনে জার্মানি একত্রিত হয়। উইলহেল্ম স্টিবার ছিল বিসমার্কের একান্ত সহকারী।

গোয়েন্দা দায়িত্ব পালন করেছিলেন বার্লিনের পুলিশ বিভাগের প্রধান হিসেবেও। বার্লিনের নাড়িনক্ষত্র জানা ছিল তার। শহরের পুরুষ পতিতাদের ব্যাপারে স্টিবার লিখেছিলেন:

‘...বিশেষত, পেডেরাস্টি (বালককামিতা) যদি বর্তমান হারে চলতে থাকে, তাহলে এক সময় হয়তো স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অগণিত হতভাগা এই অনৈতিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এসংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা আর তদন্ত প্রতি বছর আমাদের ফৌজদারি আদালতে আসে। শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকা আছে যেখানে নিয়মিত এই দানবরা সমবেত হয়। কিছু লোক; তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম হবে না, এখানে দেহব্যবসা করে। এদের মধ্যে সাধারণ সৈন্যদের সংখ্যাই বেশি। অল্প কিছু দিন আগে পুলিশ এ ধরনের একটি বেশ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে।^[৭]

মজার ব্যাপার হলো, যে বছর ছুট করে উলরিখস বার্লিন চলে গেলো, সেই ১৮৪৬ সালেই প্রকাশিত হয় উইলহেল্ম স্টিবারের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ।

বার্লিনে এক বছর কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যায় উলরিখস এবং ১৮৪৮ সালের শেষ দিকে চাকরি শুরু করে। হ্যানোভার রাজ্যের সিভিল সার্ভিসে, সরকারপক্ষীয় উকিল হিসেবে। চাকরির প্রথম চার বছরে বেশ কয়েকবার বদলির আবেদন করে উলরিখস। আবেদন মঞ্জুরও হয়। পরে জানা যাবে, নিজের বিকৃত যৌনাচারের কথা জানাজানি হবার ভয়েই বারবার বদলির আবেদন করতো সে। ১৮৫৩ সালে এক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সহকারী বিচারক পদে নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে।

তারপর ক্রমশ অবনতি হতে থাকে উলরিখসের। ধীরে ধীরে বিকৃতির ক্ষুধা আরও বাড়ে, নিজেকে সামলাতে পারে না সে। গোপন অভিসারগুলো রাতের সীমানা পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে দিনে। উন্মত্ত নেশা তাকে আত্মহারা করে তোলে। শহরের লোকেরা বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে, সহকারী বিচারক মহোদয়কে প্রায়ই সরাইখানা, অন্ধকার গলি আর শহরের ‘খারাপ’ এলাকার আশেপাশে ‘সন্দেহজনক’ লোকেদের সান্নিধ্যে দেখা যায়। ছোট শহরে কথা চাপা থাকে না। শুরু হয় কানাঘুসা। শেষমেশ অভিযোগ আসে উলরিখসের দপ্তরে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৈরি করা সরকারি নথিতে লেখা হয়,

‘সহকারী বিচারক উলরিখসকে প্রায়ই নিয়ন্ত্রণের লোকেদের সাথে এমন পরিস্থিতিতে দেখা যায়, যা থেকে ঘনিষ্ঠতার আভাস মেলে... উলরিখস অন্য পুরুষদের সাথে বিকৃত লালসা চর্চা করে বলে একটি গুজব আমার কানে

[৭] Stieber, Wilhelm. Die Prostitution in Berlin und ihre Opfer: nach amtl. Quellen u. Erfahrungen; in historischer, sittlicher, medizinischer und polizeilicher Beziehung beleuchtet. Hofmann, 1846. p 209

এসেছে।’

এ নথিতে রাষ্ট্রীয় আইনজীবী আরও লেখেন, প্রথম দিকে তিনি এ অভিযোগ বানোয়াট মনে করেছিলেন। কিন্তু পুলিশের এক কর্মকর্তা অভিযোগগুলোর সত্যতার প্রমাণ দেন। স্টেইট অ্যাটর্নী উপসংহার টানেন,

‘...উলরিখস নামীয় ব্যক্তি এখানে এবং তার পূর্ববর্তী পদগুলোতে থাকার সময় পুরুষদের সাথে বিকৃত লালসা চর্চা করেছেন; তথ্যপ্রমাণের আলোকে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।’

পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলি প্রতিবেদন আকারে হ্যানোভারের বিচার মন্ত্রণালয়ে পাঠাবার আগেই বিষয়টা জানতে পারে উলরিখস। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র জমা দেয়। এ ঘটনার পর পেশাদারি জীবনকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয় সে। ১৮৯৫ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর কোনো চাকরি করতে দেখা যাবে না তাকে। বাকিটা জীবন সে কাটিয়ে দেবে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া কিছু সম্পত্তি আর তার সাথে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকের আয় মিলিয়ে।

টাকার কষ্ট না থাকলেও চাকরি ছাড়ার পর সম্মানের অভাব অনুভব করে উলরিখস। নিজের বিকৃতি এভাবে সবার সামনে চলে আসার লজ্জা কুরে কুরে খায় তাকে। দুটো পথ খোলা ছিল তার সামনে। সম্মানের সাথে বাঁচতে হলে বিকৃত যৌনাচার ছেড়ে বেছে নিতে হবে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন। অথবা সম্মানের আশা বাদ দিয়েই চালিয়ে যেতে হবে বিকৃতি।

কিন্তু ততদিনে উলরিখস ঠিক করে ফেলেছে, যাই হোক না কেন, এ ‘মজা’ সে ছাড়তে পারবে না। বিকৃত আনন্দের নেশায় পুরোদস্তুর মজে গেছে সে। সংযমের বদলে একে পুরোদমে উপভোগ করার দিকেই তার ঝোঁক। কিন্তু বিকৃতি ছাড়তে না পারলে বাকিটা জীবন কাটাতে হবে সমাজের চোখে অপরাধী হয়ে। অন্ধকার আর ছায়ার মাঝামাঝি স্যাঁতস্যাঁতে যে জায়গাটা, যেখানে বসবাস সমাজের অপরাধী আর নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষদের, থাকতে হবে ঐখানটায়। নিজের খায়েশ মেটাতে হবে গোপনে, সভ্য সমাজের চোখের আড়ালে। এই সংকটের মুখোমুখি হয়ে কার্ল হাইনরিখ উলরিখস এমন এক সিদ্ধান্ত নেয়, যা থেকে জন্ম হয় যৌন বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের এক আন্দোলনের। যে আন্দোলন আজ—উলরিখসের মৃত্যুর প্রায় ১৩০ বছর পর—ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব জুড়ে।

উলরিখস ঠিক করে, সে কোনোটাই ছাড়বে না। তার লাগবে সবকিছু, সবটুকুই। সে সমাজের কাছ থেকে সম্মান চায়, আবার নিজের বিকৃত আনন্দও বুঝে পেতে চায় ষোলো আনা। আর দুটো এক সাথে পাবার একমাত্র উপায় হলো সমলিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক—আরও স্পষ্ট করে বললে, পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গমকে—সমাজের

চোখে গ্রহনযোগ্য করে তোলা। একে আইনি বৈধতা দেওয়া।

বাকিটা জীবন নিরলসভাবে নিজের বিকৃত যৌনাচারকে বৈধ করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাবে উলরিখস। আর এ কাজটা করতে গিয়ে গ্রহণ করবে অভূতপূর্ব এক কৌশল। আবিষ্কার করবে নতুন এক পরিচয়।

গোড়াপত্তন

চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হবার পর নিজের বিকৃতিকে সমাজের চোখে বৈধ, গ্রহণযোগ্য এবং শেষপর্যন্ত সম্মানজনক করে তোলার সংকল্প করে উলরিখস। সেই সময়কার আইনে সব ধরনের ‘সডোমি’ বা পায়ুসঙ্গম অপরাধ বলে গণ্য হতো। জার্মান আইনের যে ধারায় এ নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছিল, সেটা পরিচিত ছিল ‘প্যারাগ্রাফ ১৭৫’ নামে। উলরিখস এই আইন বাতিলের দাবি তোলে। নিজের দাবির পক্ষে হাজির করে অভূত এক যুক্তি। উলরিখস বলে, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ প্রাকৃতিক। কিছু মানুষ এভাবেই জন্মায়। মানুষের মধ্যে নারী আছে, পুরুষ আছে, আবার আছে তৃতীয় আরেক শ্রেণি। এই তৃতীয় শ্রেণির মানুষরা হলো,

‘...এমন পুরুষ যারা অন্য পুরুষদের কামনা করে। তাদের দেহ পুরুষের হলেও আত্মা নারীর। গর্ভাবস্থা থেকেই তারা এভাবে বেড়ে ওঠে।’^[৮]

উলরিখসের যুক্তি সহজ। সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যেহেতু জন্মগত, তাই পুরুষে পুরুষে পায়ুসঙ্গম অপরাধ হতে পারে না। প্যারাগ্রাফ ১৭৫, অর্থাৎ পায়ুসঙ্গম বিরোধী আইন বাতিল করতে হবে। উলরিখস এই ‘তৃতীয় লিঙ্গের’ নাম দেয় আরনিং (Urnig), আর এই অবস্থার নাম ইউরেনিয়ান (Uranian)। শব্দগুলো গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর বিখ্যাত ‘সিম্পোসিয়াম’ রচনাবলি থেকে ধার করা।

১৮৬৩ থেকে বেনামে প্রকাশিত লিফলেট ও পুস্তিকার মাধ্যমে ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করে উলরিখস। এসব লেখার শেষে বিকৃত যৌনতাকে মেনে নেওয়ার এবং প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিলের দাবি থাকতো। ১৮৬৭ সালে অনাহত অতিথির মতো মিউনিখে জার্মান আইনজ্ঞদের (জুরিস্ট) এক সম্মেলনে হাজির হয় উলরিখস। এক সকালে সম্মেলনের মধ্যে উঠে পায়ুসঙ্গম বিরোধী আইন বাতিলের প্রস্তাব তোলে। বলে, এই আইনের কারণে এমন কিছু মানুষ হয়রানির শিকার হচ্ছে, যারা নিজেদের ‘প্রাকৃতিক তাড়না’ চরিতার্থ করছে কেবল। উপস্থিত আইনজ্ঞরা দুয়ো দিয়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দিলেও, উলরিখস এটাকে দেখে নিজের বড়সড় এক বিজয় হিসেবে।

এরপর নিজ নামে লিখতে শুরু করে উলরিখস। পাশাপাশি শুরু করে অন্যান্য ‘আরনিং’-দের সংঘটিত করার চেষ্টা। কখনো সংঘ বানানো, কখনো ম্যাগাজিন

[৮] Hubert. Ulrichs. 1988

ছাপানো, চলে নানা তৎপরতা। কিন্তু কোনোটাই তেমন সাড়া পায় না। তবে এসব করতে গিয়ে জার্মানির বাইরের ‘সমমনা’ বেশ কিছু লোকের সাথে যোগাযোগ গড়ে উঠে তার। এদের মধ্যে একজন ছিল কার্লো মারিয়া কার্টবেনি নামে হাঙ্গেরির এক লেখক। ১৮৬৮ সালে উলরিখসকে লেখা এক চিঠিতে ‘আরনিং’ আর ‘ইউরেনিয়ান’ শব্দগুলোর বদলে ভিন্ন দুটো শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করে কার্টবেনি—হোমোসেজুয়াল আর হেটোরোসেজুয়াল। সমকামী এবং অসমকামী। এ শব্দগুলো তুলনামূলক বেশি ‘বৈজ্ঞানিক’ এবং ‘পেশাদারি’ শোনায়। তাই শেষমেশ এগুলোই প্রচলিত হয়ে যায়।

১৮৬০ এর দশকের শেষ দিকে নিজের ‘আন্দোলন’-এর অগ্রগতি নিয়ে উলরিখস বেশ আশাবাদী হয়ে উঠে। কিন্তু পরপর দুটো ধাক্কা এসে অগ্রগতি থামিয়ে দেয়। ১৮৬৯ সালে ৫ বছরের এক ছেলেকে বলাৎকারের অভিযোগে গ্রেফতার হয় কার্ল উইলহেল্ম ভন য্যাস্ট্রো নামে এক জার্মান নাগরিক।^[৯] এ ঘটনা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয় সমাজে। এই মামলার নানা অগ্রগতি ফলাও করে প্রচার করে পত্রিকাগুলো। তল্লাশী করতে গিয়ে ভন য্যাস্ট্রোর কাছে মেলে উলরিখসের লেখা বই - মেমনন।^[১০] মিডিয়াতে আসে, উলরিখসের চিন্তার অনুসারী ছিল ভন য্যাস্ট্রো। এতে করে উলরিখসের কার্যক্রম বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। জনমত আগে থেকেই ইতিবাচক ছিল না, এবার একেবারে বিরুদ্ধে চলে যায়।

ঠিক পরের বছর, ১৮৭০ সালে বিসমার্কের অধীনে জার্মানির একীভূতকরণ হয়। একত্রিত করা হয় সব আইন। প্যারাগ্রাফ ১৭৫ বাতিল তো হয়-ই না; বরং যেসব রাজ্যে আগে আইন ছিল না, সেখানেও আইন করে পায়ুসঙ্গমকে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করা হয়।

উলরিখস বুঝতে পারে, হঠাৎ করে সব স্রোত তার বিরুদ্ধে চলে গেছে। পরের দশ বছরে স্থিমিত হয়ে আসে তার লেখালেখি। শেষমেশ আন্দোলনের আশা বাদ দিয়ে ১৮৮০ সালে স্থায়ীভাবে ইতালিতে চলে আসে সে। আর সেখানেই ১৮৯৫ সালে ৭০ বছর বয়সে মারা যায় কার্ল হাইনরিখ উলরিখস। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে উলরিখসের সম্ভবত ধারণাও ছিল না, তার জ্বালানো স্ফুলিঙ্গ পরের শতাব্দীতে কত বড় দাবানলের রূপ নেবে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে যৌনতা এবং ‘বিয়ে’ আজ পশ্চিমা বিশ্বে বৈধ। শুধু বৈধ বললে কম বলা হবে, বিকৃত যৌনতা আজ পশ্চিমে রীতিমতো প্রশংসিত ও

[৯] Herzer, Manfred. “Zastrow-Ulrichs-Kertbeny. Erfundene Identitäten im 19. Jahrhundert.” Männerliebe im alten Deutschland. Verlag rosa Winkel, Berlin (1992).

[১০] Memnon: The Sexual Nature of Men-Loving Urnings, ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত উলরিখসের লেখা পুস্তিকা।